হা মা স

নেতৃত্ব, কাঠামো এবং সামাজিক
রাজনৈতিক ও সামরিক স্ট্রাটেজি

হা মা স

নেতৃত্ব, কাঠামো এবং সামাজিক রাজনৈতিক ও সামরিক স্ট্রাটেজি

মূল | খালেদ হারুব ও আযযাম তামিমি
অনুবাদ ও সংকলন | রাকিবুল হাসান

নতুন প্রজন্মের প্রকাশনা
ইন্তিফাদা বুকস

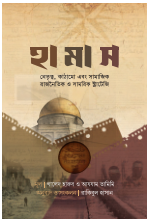

হামাস
নেতৃত্ব, কাঠামো, এবং সামাজিক রাজনৈতিক ও সামরিক স্ট্রাটেজি
মূল: খালেদ হারুব ও আযযাম তামিমি
অনুবাদ ও সম্পাদনা: রাকিবুল হাসান
স্বত্ব: অনুবাদক
প্রকাশক: আবদুর রহমান আদ-দাখিল
প্রকাশনা: ইন্তিফাদা বুকস
পরিবেশক: ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স
প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ২০২৪
প্রচ্ছদ: আহমদ বোরহান
বানান ও পৃষ্ঠাসজ্জা: মুহিব্বুল্লাহ মামুন
আইএসবিএন : ৯৭৮-৯৮৪-৯৭৫৩২-৮-৫
বিক্রয়কেন্দ্র : দোকান নং ২১
কওমি মার্কেট (১ম তলা)
৬৫/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
✆ ০১৭৬৮-৮৬ ৪৪ ২৮
অফিস : ৩১৩/১৭/১২, উত্তর সানারপাড়
সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬১
✆ ০১৭৮৯- ৮৫ ৪৬০২
অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com – wafilife.com

মুদ্রিত মূল্য
২৮৫ ৳ মাত্র

উৎসর্গ

একুশ শতকের সালাহউদ্দিন–ইসমাইল হানিয়ার চরণতলে...
এবং ফিলিস্তিনের জন্য জীবন উৎসর্গ করা নাম না-জানা হাজারো বীরের নামে...

©
লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের প্রতিলিপি বা পুনরুৎপাদন করা যাবে না, কোনো ধরনের যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে; এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

সূচি

প্রকাশকের কথা ১১
অনুবাদকের কথা ১৩
প্রাককথন ১৪
ফিলিস্তিন : এক ঝলক ১৭
ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক হাতবদল ১৭

প্রথম অধ্যায়
হামাসের ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলাম এবং ফিলিস্তিনি সংগ্রাম ২০
ইসলাম এবং ফিলিস্তিন কীভাবে পরস্পর সংযুক্ত? ২০
আরব-ইজরাইল সংঘাতে ইসলাম ও ফিলিস্তিনের আন্তঃসম্পর্ক ২১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মুসলিম ব্রাদারহুডে হামাসের শেকড় ২৫
মুসলিম ব্রাদারহুড কারা? ২৫
মুসলিম ব্রাদারহুড এবং হামাসের মধ্যকার সম্পর্ক কী? ২৬
ফিলিস্তিনে কি আরও ইসলামি সংগঠন রয়েছে? ২৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : হামাস প্রতিষ্ঠা ৩৪
অঙ্কুরিত বীজ : সামাজিক সেবামূলক কার্যক্রম ৩৪
সশস্ত্র সংগ্রামের পথে ৩৯
সর্বাত্মক সংগ্রাম ৪৪
ইন্তিফাদা কী? (প্রথম ইন্তিফাদা ১৯৮৭, দ্বিতীয় ইন্তিফাদা ২০০০) ৪৫
দমনপীড়ন ও বিপ্লবের বিস্তার ৪৮
দুনিয়াজোড়া খ্যাতি ৫৩
শায়খ ইয়াসিন : ফাউন্ডার ও মুরশিদ ৫৫

দ্বিতীয় অধ্যায়
হামাসের মতাদর্শ, স্ট্রাটেজি ও লক্ষ্য

প্রথম পরিচ্ছেদ : হামাসের মতাদর্শ ও ওয়ার্ল্ডভিউ ৬২
হামাস কী? ৬২
হামাসের স্ট্রাটেজি কী? ৬৩
হামাস পৃথিবীকে কীভাবে দেখে থাকে? ৬৫

তৃতীয় অধ্যায়
হামাস, ইজরাইল এবং জুডাইজম

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইহুদিদের প্রতি হামাসের দৃষ্টিভঙ্গি ৬৮
হামাস কি এন্টি-সেমেটিক? ৬৮
হামাসের চার্টার কি ইহুদিবিরোধী বক্তব্যে ঠাসা? ৬৯
হামাসের দৃষ্টিতে ফিলিস্তিনের ইহুদি নাগরিকদের ভবিষ্যৎ কী? ৭০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইজরাইলের প্রতি হামাসের দৃষ্টিভঙ্গি ৭৩
হামাসের দৃষ্টিতে ইজরাইল কেমন? ৭৩
হামাস কি ইজরাইলের ধ্বংস চায়? ৭৩

চতুর্থ অধ্যায়
হামাসের প্রতিরোধ ও সামরিক কৌশল

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইজরাইলের নিঃশর্ত সেনাপ্রত্যাহার ৭৮
হামাসের 'প্রোগ্রাম অব রেজিস্ট্যান্স' কী? ৭৮
মাঠপর্যায়ে হামাসের 'প্রোগ্রাম অব রেজিস্ট্যান্স' কীভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল? ৮০
হামাস কি নিজেকে নিরস্ত্র করবে বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নিরস্ত্র করা যাবে? ৮০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আত্মঘাতী আক্রমণ ৮৩
কখন এবং কেন হামাস আত্মঘাতী হামলাকে স্ট্রাটেজি হিসেবে গ্রহণ করেছে? ৮৩

পঞ্চম অধ্যায়
হামাসের রাজনৈতিক ও সামাজিক কৌশল

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইজরাইলের সাথে বিভিন্ন শান্তিচুক্তির ব্যাপারে হামাসের অবস্থান ৮৮
হামাস কেন অসলো অ্যাকর্ড প্রত্যাখ্যান করেছে? ৮৮
নির্বাচনে হামাসের বিজয়, ফিলিস্তিনিরা হামাসকে কেন ভোট দিয়েছে? ৯০
হামাসের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজসেবা ৯২

ষষ্ঠ অধ্যায়
হামাস এবং ফিলিস্তিন

প্রথম পরিচ্ছেদ : হামাসের জনপ্রিয়তা ৯৬
গাজা এবং পশ্চিম তীরে হামাস কেমন জনপ্রিয়? ৯৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হামাস এবং ফিলিস্তিনি সেক্যুলার আন্দোলন ১০০
ফাতাহের সাথে হামাসের সম্পর্ক ১০০
পিএলও সম্পর্কে হামাসের দৃষ্টিভঙ্গি কী? ১০৩
ফিলিস্তিনি খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে হামাসের দৃষ্টিভঙ্গি কী, তাদের সাথে সম্পর্ক কেমন? ১০৫

সপ্তম অধ্যায়
হামাস ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

প্রথম পরিচ্ছেদ : মুসলিম দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক ১০৮
আরব ও মুসলিম দেশগুলোর সাথে হামাসের সম্পর্ক কেমন? ১০৮
পশ্চিমের মুসলিম কম্যুনিটির সাথে হামাসের সম্পর্ক ১১০
হামাস কি গ্লোবাল জিহাদের অংশ? ১১১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : পশ্চিমের সাথে হামাসের সম্পর্ক ১১৩
হামাস কি পশ্চিমকে শত্রু হিসেবে দেখে? ১১৩
যুক্তরাষ্ট্রের সাথে হামাসের সম্পর্ক ১১৫
ইউরোপের সাথে হামাসের সম্পর্ক ১১৬

অষ্টম অধ্যায়

হামাসের নেতৃত্ব এবং কাঠামো

প্রথম পরিচ্ছেদ : নেতৃত্ব ১১৯
হামাস নেতৃত্বের ক্ষমতাকাঠমো কেমন? ১১৯
আবদুল আযিয আর রানতিসি (গাজা শাখা, ইজরাইল কর্তৃক গুপ্তহত্যার শিকার) ১২১
মাহমুদ আয যাহহার (গাজা শাখা, হামাস সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী) ১২২
ইসমাইল হানিয়া (গাজা শাখা, হামাস সরকারের প্রধানমন্ত্রী) ১২৩
আযিয দুয়াইক (পশ্চিম তীর, ফিলিস্তিনি পার্লামেন্টের স্পিকার) ১২৫
নাসের শায়ের (পশ্চিম তীর, ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার এবং শিক্ষামন্ত্রী) ১২৬
খালিদ মিশাল (বৈদেশিক শাখা, রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রধান) ১২৬
মুসা আবু মারযুক (বৈদেশিক শাখা, পলিটিক্যাল ব্যুরোর ডেপুটি চিফ) ১২৭
ইয়াহইয়া সিনওয়ার ১২৯
হামাসের অর্থের উৎস কী? ১৩২

পরিশিষ্ট

প্রতিরোধ সংগঠন থেকে সরকার

নির্বাচন ১৩৪
সরকার ও সমন্বয় ১৩৮
সংঘাত ও জাতীয় ঐক্যের সরকার ১৪২
টানেল ও যুদ্ধ ১৪৬

প্রকাশকের কথা

ফিলিস্তিন। ঐতিহাসিক এই ভূখণ্ডের, প্রায় চার হাজার বছরের ইতিহাসের পুরোটা জুড়েই রয়েছে দখল-প্রতিরোধ আর উত্থান-পতনের অজস্র উপাখ্যান। সময়ের স্রোত এত বেশি বাঁক খেয়েছে এইখানে এসে, কালের ঘূর্ণিপাক এত ভাঙাগড়ার ইতিহাস রচনা করেছে এই ভূখণ্ডে—যা পৃথিবীর মানচিত্রে বিরল। আজ অবধি ইতিহাসের এই ধারাবাহিকতা সামান্যও ক্ষুণ্ন হয়নি যেন।

মহামান্য খলিফা উমরের হাতে মুসলিম শাসনাধীনে আসার পর ক্রুসেডের সময়টা ছাড়া মোটের ওপর এই ভূমির ইতিহাস ছিল শান্ত। এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে ব্রিটিশদের নাপাক পদচারণায় আবারও অশান্ত হয়ে ওঠে এই নগরী। ব্রিটিশ শক্তির হাত হয়ে অবৈধ ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সেই অশান্তির ষোলোকলা পূর্ণ হয়। ইউরোপ থেকে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও বিতাড়িত হয়ে, এই শান্ত ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয় মানবতার নিকৃষ্ট দুশমন ইহুদির দল। চতুর ইউরোপ একঢিলে দুই পাখি মারার বন্দোবস্ত করে। নিজেদের মুক্তির পাশাপাশি মুসলিমবিশ্বকে অশান্ত করে রাখার সুযোগ তৈরি হয়। এই উভয় উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গোটা পশ্চিম দুই হাত ভরে দান-খয়রাত দিয়ে এক কৃত্রিম আজদাহায় পরিণত করে ইসরাইলকে।

এদিকে একেবারে ব্রিটিশ-যুগ থেকেই ফিলিস্তিনি মুসলিমরা প্রতিরোধ জারি রেখেছিল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, ইসরাইল প্রতিষ্ঠার পর যা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। আগ্রাসী শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের এমন সুদীর্ঘ দাস্তান পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। একশত বছরের বেশি সময় ধরে চলা এই প্রতিরোধ আন্দোলনের ইতিহাসেরই এক প্রত্যুজ্জ্বল তারকার নাম হামাস।

পৃথিবীতে এখন খুব কম মানুষই এমন আছে, যারা হামাস নামটির সঙ্গে পরিচিত না। অন্তত যারা ইসরাইল-ফিলিস্তিন নাম দুটি শুনেছি, তাদের মধ্যে হামাস সম্পর্কে কিছুই জানে না এমন মানুষ হয়তো খুঁজেই পাওয়া যাবে না।

ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলনে হামাসই একমাত্র নাম নয়; বরং এর আগে এর চেয়ে ক্যারিশমেটিক অনেক দলের উপস্থিতি ছিল, কিন্তু সেইসব নাম এখন

কেবল ইতিহাস-পাতায় খুঁজে পাওয়া যাবে। পৃথিবীর মানুষ তো বটেই, খুব সম্ভবত ফিলিস্তিনের নতুন প্রজন্মও তাদেরকে মনে রাখেনি। কিন্তু সেই জায়গায় হামাস এত বেশি ব্যতিক্রম ও স্বতন্ত্র যে, খুব কাছাকাছি সময়ে তাদের হারিয়ে যাবার আশঙ্কা তো নেই-ই, এমনকি হারিয়ে গেলেও পৃথিবীর মানুষ শীঘ্রই তাদেরকে ভুলবে না।

পৃথিবীজুড়েই মুসলমানের আজ ঘোর দুর্দিন। প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই মুসলিমরা নতুন উত্থানের জন্য নানাবিধ প্রচেষ্টা ও কলা-কৌশলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছেন। কিন্তু বাহ্যত, প্রচেষ্টার তুলনায় প্রত্যাশার প্রতিফলন যেন খুবই ক্ষীণ। অথচ একই সময়ে সবচেয়ে কম সুযোগ ও সর্বাধিক সীমাবদ্ধতার ভেতরে থেকে হামাস যা করছে এবং করতে পারছে, তাতে হামাসকে অধ্যয়ন করা পৃথিবীর সব স্বাধীনতাকামী মুসলমানের জন্য জরুরি হয়ে পড়েছে। সেই জরুরত পূরণার্থেই বাংলা ভাষাভাষী মুসলিমদের জন্য আমাদের এই তোহফা।

দায়িত্ব নিয়েই বলছি যে, ছোট্ট এই বইটি থেকে আগ্রহী পাঠক হামাসের এই বিপুল শক্তির উৎস এবং ক্যারিশমেটিক সাফল্যের রহস্য সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা লাভ করতে পারবেন। পাশাপাশি হামাসের আদর্শিক জায়গা, ভেতর ও বাইরের কৌশলগত অবস্থান, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কাঠামো, সামাজিক রাজনৈতিক ও সামরিক কর্মপন্থা, আন্তঃদলীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, নেতৃত্বের স্তর, মানদণ্ড ও উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের সংক্ষিপ্ত কর্মজীবনী-সহ হামাসের সকল দিক ও যাবতীয় কলকব্জার এমন সংক্ষেপ ও সমৃদ্ধ বিবরণ এই বইয়ে উঠে এসেছে যে, পাঠ শেষে একজন পাঠকের এক মুহূর্তের জন্য মনে হতে পারে—এখন চাইলে আমিও হামাসের মতো একটা কিছু দাঁড় করিয়ে ফেলতে পারব।

বিনীত,
আবদুর রহমান আদ-দাখিল
ডেমরা, ঢাকা
২৭/০৭/২০২৪ খ্রি.

অনুবাদকের কথা

: বইটি কি অনুবাদ বই?
-ঠিক তা না।
: তাহলে কি মৌলিক?
-মৌলিকের কাতারেও পড়ে না।
এটি মূলত কয়েকটি বইয়ের সামারি। বইগুলো হলো—

- ফিলিস্তিনি লেখক ও এক্টিভিস্ট আযযাম তামিমির Hamas: A History from Within এবং এই বইয়ের পরিবর্ধিত সংস্করণ Hamas: Unwritten Chapters
- সেক্যুলার ফিলিস্তিনি লেখক খালেদ হারুবের Hamas : A Beginner's Guide
- জেরুজালেমে বসবাসকারী ইতালিয়ান লেখক ও ইতিহাসবিদ পাওলা কারিদির Hamas : From Resistance to Government
- ইজরাইলি রাজনীতি বিশেষজ্ঞ শ্যল মিশাল এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ও ইজরাইলি ইতিহাসবিদ আব্রাহাম সেলার রচিত The Palestinian Hamas : Vision, Violence, and Coexistence

বইয়ের সোর্সের এই বৈচিত্র্য থেকেই অনুমান করা যায় যে এতে কোনো এক পক্ষের ন্যারেটিভ প্রাধান্য পায়নি। আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিশেষজ্ঞরা যেসব বিষয়ে একমত, সেগুলো উঠে এসেছে।
বইয়ের অধিকাংশ তথ্য এই চারটি বই থেকে নেওয়া। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অতিসাম্প্রতিক বিষয়গুলো আমি নির্ভরযোগ্য সোর্স থেকে সংগ্রহ করেছি এবং এগুলোর সূত্র উল্লেখ করে দিয়েছি। ব্যতিক্রম শুধু বইয়ের শেষ চ্যাপ্টারটি। এতে বেশকিছু তথ্য ডয়েচে ভেলে ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক মিডিয়ার ডকুমেন্টারি থেকে নেওয়া হয়েছে। পাঠের গতিশীলতা রক্ষার উদ্দেশ্যে সেগুলো উল্লেখ করা হয়নি।
একুশ শতকের সবচাইতে দুর্ধর্ষ, দুঃসাহসী ও রহস্যময় মুক্তিকামী যোদ্ধাদের জগতে আপনাকে স্বাগত।

রাকিবুল হাসান
৩০ জুলাই, ২০২৪ খ্রি.

প্রাককথন

একসময় ফিলিস্তিনি জনগণ ও ফিলিস্তিনি শহরগুলোতে ইজরাইলের আক্রমণের প্রতিশোধ হিসেবে ইজরাইলি শহরগুলোতে পরিচালিত সুইসাইড আক্রমণের মাধ্যমে সারা দুনিয়াকে কাঁপিয়ে দিত হামাস। ২০০৬ সালে তারা আরও একবার পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দেয়। তবে এবারে সুইসাইড বোমা দিয়ে নয়; বরং দুনিয়ার সব হিশেবনিকেশ উলটে দিয়ে ২৫শে জানুয়ারির নির্বাচনে বিজয়ের মাধ্যমে। এই নির্বাচনে হামাস প্যালেস্টিনিয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে (পিএলসি) ভূমিধস বিজয় অর্জন করে। যদিও পিএলসির ক্ষমতা সীমিত, আধা-স্বাধীন; তবুও পশ্চিম তীর এবং গাজায় ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের প্রতীক এই পিএলসি। নির্বাচনে বিজয়ের মাধ্যমে ১৯৮৭ সালে হামাস গঠনের পর থেকে এই-ই প্রথমবারের মতো হামাস সরকার গঠন করে এবং ফিলিস্তিনের মুক্তি-সংগ্রামে প্রধান শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়।

পশ্চিমে হামাসকে ট্যাগ দেওয়া হতো 'সন্ত্রাসী' সংগঠন। মিডিয়ায় প্রচারিত হতো 'গোপন' সংগঠন হিসেবে। সেই গোপন সন্ত্রাসী সংগঠন নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে গোটা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেয়। কীভাবে তারা এত বিপুল জনসমর্থন লাভ করে নির্বাচনে বিজয়ী হয়? হামাসের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সেক্যুলার ফাতাহ, বিগত অর্ধ-শতাব্দী ধরে যারা নিরবচ্ছিন্নভাবে ফিলিস্তিন শাসন করেছে। ইজরাইল, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, আরব রাষ্ট্রগুলো থেকে শুরু করে এমনকি জাতিসংঘ পর্যন্ত চেয়েছে ফাতাহ বিজয়ী হোক। সব প্রতিকূলতা কাটিয়ে, সব প্রচেষ্টা ছাপিয়ে হামাস বিজয়ী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। গোটা পৃথিবীর তখন একটাই জপ— এটা কী হলো! ভুলটা কোথায়!

আসলে ফিলিস্তিনের নির্বাচন ঘিরে কোনো ভুল-শুদ্ধ ছিল না। ভুল ছিল হামাসকে মূল্যায়নে। ক্রমাগত হামাসের ব্যাপারে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে, তাদের শক্তি ও ক্ষমতাকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। পশ্চিমা রাজনীতিবিদ এবং আমজনতার দৃষ্টিতে হামাস সর্বদাই 'সন্ত্রাসী' সংগঠন রয়ে গেছে। যার একমাত্র লক্ষ্য হলো লক্ষ্যহীনভাবে ইজরাইলিদের হত্যা করা। অথচ নিজেদের ভূমিতে লাখো ফিলিস্তিনি হামাসকে দেখে থাকে সমাজের গভীরে শেকড় প্রোথিত সামাজিক-রাজনৈতিক এবং জনপ্রিয় শক্তি হিসেবে। ফিলিস্তিনিদের দৃষ্টিতে হামাস একইসাথে ইজরাইলি দখলদারির বিরুদ্ধে সুসংগঠিত সামরিক শক্তি এবং

তৃণমূল পর্যায়ে সমাজসেবা, ধর্মীয় ও মতাদর্শিক আন্দোলন, অন্যান্য দল ও দেশের সাথে পাবলিক রিলেশন মেইনটেইন করা এক সংগঠন।

এই বই লেখা হয়েছে 'প্রকৃত হামাসের' গল্প শোনাতে, বিকৃত কিংবা অতিরঞ্জিত নয়। বিগত ১৬ বছর ধরে আমি হামাসের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের ওপর নজর রাখছি। আমি তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, সামরিক এবং ধর্মীয় দিক নিয়ে বিপুল লেখালেখি করেছি। বহু গ্রন্থ, বুক চ্যাপ্টার, জার্নাল আর্টিক্যাল রচনার মাধ্যমে আমি যেমন হামাসকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি, পাশাপাশি সেই উপলব্ধি পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ারও চেষ্টা করেছি। হামাস সম্পর্কে আমার গভীর জ্ঞান এবং তাদের সাথে আমার সরাসরি সংযোগের ফলে এই বই আমি 'মুক্তহস্তে' লেখেছি। টীকাটিপ্পনী আর রেফারেন্সের ঝামেলায় যাইনি। কারও প্রয়োজন হলে আমার অন্যান্য রচনায় এগুলো পেয়ে যাবেন।

হামাস সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি তাদের পক্ষে নয়, বিপক্ষেও নয়। আমি হামাসের উত্থানকে দেখে থাকি অস্বাভাবিক ও নির্মম দখলদারির স্বাভাবিক ফল হিসেবে। ফিলিস্তিনে ইজরাইলের চলমান ঔপনিবেশিক দখলদারির ফলে হামাসের কট্টরপন্থা অত্যন্ত অনুমানযোগ্য। সেই আন্দোলনের প্রতিই ফিলিস্তিনিদের সমর্থন—যারা এই দখলদারির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ডাক দেয়, ফিলিস্তিনিদের অধিকার, স্বাধীনতা আর স্বায়ত্তশাসনের অঙ্গীকার করে। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে তারা হামাসকে দেখে থাকে—তাদের অধিকারের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে।

খালেদ হারুব

ফিলিস্তিন : এক ঝলক

ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক হাতবদল

ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের বাইবেলীয় ইতিহাসে প্রায় ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে এখানে নানা উত্থানপতনের ঘটনা বিবৃত হয়েছে। এরও পূর্বে রয়েছে ইউসুফ আ.-এর সাথে বনি ইসরাইলের কেনান—যা আজকের লেবানন, সিরিয়া, ফিলিস্তিন—ছেড়ে মিশরে চলে যাওয়ার ইতিহাস। সেখান থেকে মুসা আ.-এর সাথে পুনরায় ফিলিস্তিনে ফিরে আসা। অতঃপর দাউদ আ.-এর নেতৃত্বে সেখানে বনি ইসরাইলের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা; যে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ উন্নতি সাধিত হয়েছিল নবি সোলাইমান আ.-এর শাসনকালে। ৯৩০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সোলাইমান আ.-এর মৃত্যুর পর তার প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। উত্তর অংশের নাম ইজরাইল, দক্ষিণ অংশের নাম জুদাহ বা জুডিয়া। তারপর ক্রমে এখানে এসিরিয়ান ও ব্যাবলোনিয়ানদের আক্রমণ ঘটে।

ব্যাবলোনিয়ান (ক্যাদলিয়ান) রাজা নেবুচাদনেজার ৫৮৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে উত্তরের ইজরাইল রাজ্য ধ্বংস করে দেন। এখানকার ইহুদিদেরকে ধরে ব্যাবিলনে নিয়ে যান। এরপর আসে পারসিকরা। পারসিক সম্রাট সাইপ্রাস দ্য গ্রেট ৫৩৯-৩৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবলোনিয়ান সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দেন এবং তাদের কবল থেকে ব্যাবিলন উদ্ধারের পর সেখানে থাকা ইহুদিদেরকে নিজেদের স্বদেশ জেরুজালেমে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন।

পারসিয়ান সাম্রাজ্যের পর ফিলিস্তিন গ্রিকদের দখলে যায়। গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের শাসনাধীনে ৩৩৩ থেকে ৩২৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের ভেতর পারসিয়ান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ফলে ফিলিস্তিনও পারসিকদের হাত থেকে গ্রিকদের শাসনাধীনে চলে যায়। ইসা আ.-এর জন্মের ৬৯ বছর আগে গ্রিকদের হটিয়ে এখানে আসে রোমানরা। সেই থেকে নানা উত্থানপতন, দখল-পুনর্দখল, বিদ্রোহ-পালটা বিদ্রোহের ভেতর দিয়ে ফিলিস্তিন প্রায় ছয় শতাব্দী অতিক্রম করে।

অবশেষে ৬৩৫-৩৮ খ্রিষ্টাব্দে উমর রা.-এর শাসনামলে জেরুজালেম মুসলিমদের হাতে আসে। ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম ক্রুসেডের মাধ্যমে এটি মুসলিমদের হাতছাড়া হয়ে যায়। মধ্যপ্রাচ্যে ইউরোপ থেকে আসা খ্রিষ্টানদের চারটি পৃথক রাজ্য গড়ে উঠে, যার একটি ছিল জেরুজালেম। এর প্রায় ৯০ বছর পর ১১৮৭ সালে হিত্তিন বা হাত্তিনের যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবি ক্রুসেডারদের কবল থেকে জেরুজালেমকে মুক্ত করেন। এরপর নানা সাম্রাজ্যের হাত হয়ে ১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দে এটি উসমানিদের হাতে আসে। জেরুজালেম শাসিত হতো ইস্তাম্বুল থেকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় ১৯১৮ সালে। এরপর উসমানি সালতানাত ভেঙে দেওয়া হয়। সালতানাতের শাসিত অঞ্চলগুলো ইউরোপীয়রা ভাগজোগ করে নেয়। জেরুজালেম দেওয়া হয় ব্রিটেনের ভাগে। ব্রিটেনের শাসনকালকে বলা হয় ম্যান্ডেটযুগ (১৯১৮-১৯৪৭)। ১৯২২ সালে ফিলিস্তিনের ওপর ব্রিটিশ ম্যান্ডেট জাতিসংঘের পূর্বসূরি সংস্থা জাতিপুঞ্জ বা লিগ অব ন্যাশন্সে স্বীকৃতি পায়। ম্যান্ডেট শেষ হয় ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে। সেদিনই ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয়। অবশ্য এর আগেই ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে জাতিসংঘে ফিলিস্তিনের ভূমি ইউরোপের ইহুদিদেরকে দিয়ে দেওয়ার এবং সেখানে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পাশ হয়। ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে থেকে এখনো পর্যন্ত ইজরাইল রাষ্ট্র টিকে আছে।

ইজরাইল প্রতিষ্ঠার আগে এবং পরে—ফিলিস্তিনিরা নানাভাবে, নানা উপায়ে দখলদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ সংগ্রামের ইতিহাসে 'হামাস' একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

***

প্রথম অধ্যায়

হামাসের ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলাম এবং ফিলিস্তিনি সংগ্রাম

ইসলাম এবং ফিলিস্তিন কীভাবে পরস্পর সংযুক্ত?

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিমদের কল্পনায় ইসলাম এবং ফিলিস্তিন একই সুতোয় গাঁথা। ফিলিস্তিন যেমন ইসলামে পবিত্রতায় আচ্ছাদিত, অনুরূপ ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহের কারণে ইহুদি এবং খ্রিষ্টানদের কাছেও ধর্মীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সপ্তম শতাব্দীতে ইসলাম প্রচারের সূচনালগ্নে মুসলিমরা মসজিদুল আকসার দিকে ফিরে নামাজ আদায় করত। বাইতুল মাকদিস (জেরুজালেম) মুসলিমদের নিকট মক্কা-মদিনার পর তৃতীয় পবিত্রতম স্থান। কুরআনে এই ভূমির কথা বারবার এসেছে, অনুরূপ রাসুলুল্লাহর হাদিসেও অসংখ্যবার উল্লেখ হয়েছে। ফিলিস্তিন নিয়ে কুরআনুল কারিমের একটি সুরার নামকরণই রয়েছে—সুরাতুল ইসরা। এতে মক্কা থেকে রাসুলুল্লাহর জেরুজালেম গমন এবং সেখান থেকে মেরাজ গমনের কথা বিবৃত হয়েছে। মেরাজের ঘটনা মুসলিমদের নিকট খুবই স্পেশাল একটি মুজিজা হিসেবে শ্রদ্ধার্হ। স্বর্গালোকে আরোহণকালে রাসুলুল্লাহ যে পাথর থেকে ভ্রমণ শুরু করেছিলেন, সেখানেই নির্মিত হয়েছে আজকের ডোম অব রক (সোনালি গম্বুজ)। ইহুদিদের বিশ্বাসমতে এর পাশেই ছিল সোলাইমান আ.-এর প্রাচীন মন্দির বা ফার্স্ট টেম্পল।

ফিলিস্তিনের প্রতি ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় গুরুত্ব ইসলামেও স্বীকৃত। ঈসা আ. ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মুসা আ. হিজরত করে এই ফিলিস্তিনেই এসেছিলেন।

ধর্মীয় গুরুত্বের পাশাপাশি ফিলিস্তিন সবসময়ই ভৌগোলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এটি আফ্রিকা এবং এশিয়ার সাথে মধ্যপ্রাচ্যের সংযোগস্থল। এর পাশে রয়েছে সুদীর্ঘ ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল। আরব উপদ্বীপ, মিশর ও সিরিয়ার গোলান মালভূমিকে সংযুক্ত করেছে এই উপকূলীয় পথ। ধর্মীয় ও ভূরাজনৈতিক গুরুত্বের কারণে ফিলিস্তিন সবসময়ই যুদ্ধ ও আগ্রাসনের প্রাণকেন্দ্র ছিল। ৬৩৮

খ্রিষ্টাব্দে মুসলিমরা ফিলিস্তিন বিজয় করে। এরপর থেকে এই ভূমির রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক ভিত্তিসমূহের প্রধান উপাদান ছিল ইসলাম।

১০৯৭ সাল থেকে পরবর্তী দুইশত বছরের জন্য পশ্চিমা ক্রুসেডাররা এই ভূমির নিয়ন্ত্রণ লাভের উদ্দেশ্যে একের পর এক যুদ্ধ করতে থাকে। অবশেষে জেরুজালেমকে খ্রিষ্টবাদ অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করতে সক্ষম হয়। খ্রিষ্টানদের দখলে যাওয়ার পূর্বে চারশত বছর ধরে মুসলিমরা এই অঞ্চলটি শাসন করেছে। সব ধর্মের মানুষকে শান্তিপূর্ণভাবে এই অঞ্চলে বসবাসের অনুমতি দিয়েছে। সব ধর্মের তীর্থযাত্রীকে মুসলিমরা এখানে স্বাগত জানিয়েছে, সব ধর্মের লোকের জন্যই এটি প্রবেশযোগ্য ছিল—খ্রিষ্টান, ইহুদি, পারসিয়ান, অর্থোডক্স খ্রিষ্টান, কপটিক ও অন্যান্য সবাই।

চারশত বছরের দ্বিধাহীন আসা-যাওয়ার পর মুসলিমদেরকে পরাজিত করে ক্রুসেডাররা অত্যন্ত নির্মমভাবে জেরুজালেমের দখল নেয়। এখানকার মুসলিম অধিবাসীদের হত্যা করে পরবর্তী ৭০ বছরের জন্য তারা এর শাসনভার নিতে সক্ষম হয়েছিল। ১১৮৭ সালে সুলতান সালাহউদ্দিন ক্রুসেডারদেরকে পরাজিত করে চিরকালের জন্য মুসলিমদের স্মৃতিতে ভাস্মর হয়ে আছেন। ইসলামের কিংবদন্তিতুল্য মহানায়কদের একজনে পরিণত হয়েছেন। তার বিজয় ইসলাম ও মুসলিমদের পরাজয়, অশ্রদ্ধা ও অবমাননার অবসান ঘটিয়েছে। সালাহউদ্দিনের বিজয়ের ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে ছাই থেকে পুনরায় জ্বলে উঠার প্রতীক। ক্রুসেডের নামে ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের আগ্রাসন এখনো বহু আরব ও ফিলিস্তিনির দৃষ্টিতে বর্তমান জায়োনিজমের প্রকৃত ব্লুপ্রিন্ট। জায়োনিস্টরাও একই উৎস—ইউরোপ—থেকে আগত।

আরব-ইজরাইল সংঘাতে ইসলাম ও ফিলিস্তিনের আন্তঃসম্পর্ক

মুসলিম মানসে ফিলিস্তিনের শাসক কে—এটি ইসলাম ও মুসলিমদের শক্তিমত্তা কিংবা দুর্বলতার প্রতীক। ফিলিস্তিন যদি বহিরাগত দখলদার কর্তৃক শাসিত হয়, যেমন মধ্যযুগে ক্রুসেডার কিংবা বর্তমানকালের জায়োনিস্ট, তবে মুসলিমরা একে নিজেদের দুর্বলতা ও পরাজয়ের নিদর্শন বিবেচনা করে।

১২৯১ সালে ক্রুসেডারদের চূড়ান্ত পতনের পর টানা সাতশত বছর ধরে ফিলিস্তিন মুসলিমদের শাসনাধীনে ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভেঙে যাওয়ার আগ পর্যন্ত উসমানি সালতানাত ফিলিস্তিন শাসন করেছে। উসমানিদের প্রতি

আরব ও অনেক ফিলিস্তিনি ক্ষুব্ধ থাকলেও যেহেতু উসমানি শাসনের ভিত্তি ছিল ইসলাম, তাই ফিলিস্তিন বৃহত্তর আরব ও মুসলিম বিশ্বের অংশরূপেই ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অস্ত্রবিরতি চুক্তির মাধ্যমে উসমানি সালতানাত ভেঙে পড়ার পর মধ্যপ্রাচ্যের ভূমিগুলো বিজয়ী ইউরোপীয়দের মধ্যে ভাগযোগ করে দেওয়া হয়। অঞ্চলগুলোর স্থায়ী রাজনৈতিক কাঠামো স্থির হওয়ার আগ পর্যন্ত এগুলো ইউরোপীয়দের ম্যান্ডেটরূপে থাকবে। ফলে ১৯২২ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত ফিলিস্তিন ব্রিটিশ ম্যান্ডেটরূপে ছিল। যদিও ফিলিস্তিনিদের মানসে ইসলামি ঐতিহ্য এবং এর প্রতি আনুগত্য গভীরভাবে প্রোথিত ছিল, কিন্তু ব্রিটিশদের চিন্তা আচ্ছন্ন ছিল জায়োনিজমের শক্তিশালী স্রোতধারায়। ১৯১৭ সালে বেলফোর ফিলিস্তিনে ইহুদিদের একটি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতি তার সমর্থন ব্যক্ত করার সাথে সাথে ইউরোপের নানা অংশ থেকে ইহুদিদের ফিলিস্তিনমুখী স্রোত শুরু হয়। ব্রিটিশ-শাসিত ফিলিস্তিনে ১৯৩০ এবং ৪০-এর দশকে ইহুদি অভিবাসীদের সংখ্যা হুহু করে বৃদ্ধি পায়।

ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সাবেক অটোমান-শাসিত অঞ্চলের আরব স্বাধীনতাকামী আন্দোলনগুলো দুটি ধারায় নিজেদেরকে সংগঠিত করে—ইসলাম এবং আরব জাতীয়তাবাদ। উভয় ধারায়ই জনগণকে সংগঠিত করার শক্তি বৃদ্ধি পায়। ১৯২০ ও ৩০-এর দশকে ফিলিস্তিনিরা ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের বিরুদ্ধে এই মিশ্র ইসলামি ধারায় বিদ্রোহ জারি রেখেছিল।

কিন্তু ফিলিস্তিনিদের ভাগ্য জড়িয়ে যায় ফিলিস্তিনের বাইরেও। নিছক দখলদার আর দখলকৃতের মধ্যকার সংগ্রামের মাধ্যমে তা আর নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল না। একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে শোচনীয় অর্থনীতি, অপরদিকে জায়োনিস্টদের উপর্যুপরি সন্ত্রাসী আক্রমণের ফলে ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনের ওপর ব্রিটেনের দখল গুরুতরভাবে হ্রাস পায়। জাতিসংঘ ফিলিস্তিনের বিভাজন নিয়ে একটি প্রস্তাব পেশ করে। প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর ১৯৪৮ সালের মে মাসে ব্রিটিশরা ফিলিস্তিন থেকে সরে যায়। প্রায় সাথে সাথেই ইহুদি রাষ্ট্র ইজরাইল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্র তাৎক্ষণিকভাবে ইজরাইলকে স্বীকৃতি দিলেও ফিলিস্তিন হারিয়ে যায় ইতিহাসের গহ্বরে। নিজ ভূমিতেই তারা স্বীকৃতিহীন!

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যেসব প্রতিরোধ সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল, তন্মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং ফিলিস্তিনিদের গৌরবের উৎস আন্দোলনটি ছিল ইযযুদ্দিন আল কাসসামের আন্দোলন। ১৯৩০-এর দশকে। শায়খ ইযযুদ্দিন

আল কাসসাম ছিলেন একজন আলেম। তিনি ব্রিটিশ ও তাদের মিত্রদের—ইউরোপ থেকে আসা বানের জলের মতো সশস্ত্র জায়োনিস্ট সেটলার—বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। বহু বছর পর ১৯৯০-এর দশকে হামাস তাদের সশস্ত্র শাখার নামকরণ করে শায়খ ইযযুদ্দিন আল কাসসামের নামে।

ইউরোপীয়দের ছত্রছায়ায় ফিলিস্তিনের ভূমিতে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মতলব ফাঁস হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই ১৯২০-এর দশক থেকে ফিলিস্তিনিরা জেরুজালেম এবং পবিত্রভূমি রক্ষায় বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের সমর্থন আদায়ে সচেষ্ট হয়ে উঠে। ১৯৩৮ সালে জেরুজালেমে বাইতুল মাকদিস প্রতিরক্ষার প্রথম কনফারেন্স আহ্বান করা হয়। পাকিস্তান-ইন্দোনেশিয়ার মতো দূরবর্তী মুসলিম দেশ থেকেও প্রতিনিধি পাঠানো হয়। জায়োনিস্ট সংগঠনগুলোর ক্রমাগত সামরিকীকরণ এবং সশস্ত্র কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে ফিলিস্তিনে মুসলিম সংগঠনগুলোর কার্যক্রমও বৃদ্ধি পায়।

১৯৪৮ সালে ইজরাইল প্রতিষ্ঠার ঘোষণায় মুসলিম বিশ্বজুড়ে অবমাননার এক শীতল স্রোত বয়ে যায়। ইহুদিরা ফিলিস্তিনের অধিকাংশ ভূমি দখল করে নেয়। মসজিদুল আকসা দখল থেকে তারা ছিল মাত্র কয়েক কদম দূরে। মিশর, ইরাক, জর্ডান, লেবানন এবং সিরিয়া ইজরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে। কিন্তু জায়োনিস্ট এবং ইউরোপীয়দের মৈত্রী আরবদের হারিয়ে দেয়। এই পরাজয় ছিল অবিশ্বাস্য। ফিলিস্তিনি, আরব ও মুসলিমদের মনস্তত্ত্বে এটি সুগভীর প্রভাব ফেলে। ফিলিস্তিনের প্রতিরক্ষায় ইসলাম মুসলিম বিশ্বজুড়ে ঐক্যের সূত্ররূপে প্রচারিত হতে শুরু করে। এই যুদ্ধের পর ফিলিস্তিন বলতে আসলে আলাদা কোনো রাষ্ট্র ছিল না। কারণ পশ্চিম তীর দখল করে নিয়েছিল জর্ডান, গাজা ভূখণ্ড চলে যায় মিশরের দখলে। বাদবাকি ভূমিটুকু তখন ইজরাইল।

১৯৫০ এবং ৬০-এর দশকে আরব ও ফিলিস্তিনিরা জাতীয়তাবাদী ও মার্ক্সিস্ট মতাদর্শে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিল। ইজরাইলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংগ্রামে তারা এই মতাদর্শেই উজ্জীবিত ছিল। ফলে ফিলিস্তিন, ফিলিস্তিনের সীমান্তসংলগ্ন দেশ—মিশর, সিরিয়া ও জর্ডান এবং দূরবর্তী আরব দেশ—ইরাক, লিবিয়া এবং আলজেরিয়াতে ইসলামি আন্দোলনগুলো সাইডলাইনে চলে যায়। জনগণকে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে ইসলামি মতাদর্শ পেছনের সিটে চলে যায়।

ফিলিস্তিন ও আরবদের জন্য এর চেয়েও ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক আরেকটি ধাক্কা অপেক্ষা করছিল। ১৯৬৭ সাল। যখন ইজরাইল একযোগে মিশর, সিরিয়া ও

জর্ডানের ওপর আক্রমণ চালায় এবং তাদের ভূমি দখল করে নেয়। মিশরের হাত থেকে গাজা তো গাজা, এমনকি সিনাই উপত্যকাও দখল করে নেয়। সিরিয়া থেকে ছিনিয়ে নেয় গোলান মালভূমি। আর জর্ডান থেকে নিয়ে নেয় পশ্চিম তীর, জেরুজালেম আর আল আকসা মসজিদ। আরবদের যৌথ সেনাবাহিনীর এই ঘোরতর পরাজয়ের পর ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদী এবং মার্ক্সবাদী মতাদর্শ মিইয়ে যেতে শুরু করে। পরিবর্তে ইসলামি আন্দোলন এবং রাজনৈতিক ইসলামের ক্রম-উত্থান ঘটতে শুরু করে। ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে ফিলিস্তিনের শহরগুলোতে ফিলিস্তিনি ইসলামি সংগঠনগুলোর অবস্থান শক্তিশালী হতে শুরু করে। ৭০-এর দশকের শেষদিকে ইরানে ইসলামি বিপ্লবের সফলতা এবং ১৯৮২ সালে লেবাননে পিএলও-এর পরাজয়ের পর ফিলিস্তিনে ইসলামপন্থীদের উত্থান শুরু হয়। তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ—ফাতাহ-এর দীর্ঘ পতনের সূচনা ঘটে। ইসলাম পুনরায় ফিলিস্তিনের রাজনীতির প্রাণকেন্দ্রে চলে আসে।

***

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুসলিম ব্রাদারহুডে হামাসের শেকড়

মুসলিম ব্রাদারহুড কারা?

চিন্তা ও গঠনের সূচনা বিবেচনায় হামাসের শেকড় এই অঞ্চলের মুসলিম ব্রাদারহুডে প্রোথিত। উসমানি সাম্রাজ্যের পতনের প্রাক্কালে ১৯২৮ সালে মিশরে মুসলিম ব্রাদারহুড (ইখওয়ানুল মুসলিমিন) প্রতিষ্ঠিত হয়। একমাত্র ইরান বাদে গোটা আরব অঞ্চলের সমস্ত ইসলামি রাজনৈতিক আন্দোলনের সূতিকাগার ধরা যায় মুসলিম ব্রাদারহুডকে। বিগত আট দশকে প্রায় প্রতিটি আরব দেশে রাজনীতি ও ধর্মের মিশেলে সংগঠনটির শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৪৫ সালে, ইজরাইল প্রতিষ্ঠার তিন বছর পূর্বে, জেরুজালেমে মুসলিম ব্রাদারহুডের ফিলিস্তিন শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।

যদিও মুসলিম ব্রাদারহুড এই অঞ্চলে মূলধারা এবং তুলনামূলক মধ্যমপন্থী। বিগত দুই দশকে এ থেকে অনেক কট্টরপন্থী দলের উদ্ভব ঘটেছে। দলটির প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ কুতুবের চিন্তাধারা মুসলিম বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক চিন্তাধারায় গভীর প্রভাব রেখেছে। মুসলিম ব্রাদারহুডের মূল লক্ষ্য হলো প্রতিটি মুসলিম দেশে স্বতন্ত্র ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রতিটি রাষ্ট্রকেই বৃহত্তর মুসলিম উম্মাহর প্রতিনিধিত্বকারী একটি একক রাষ্ট্রের (খিলাফাহ) সাথে যুক্ত করা।

মুসলিম ব্রাদারহুড এবং এর অনুরূপ বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাকগ্রাউন্ড ও বোঝাপড়া লালনকারী আন্দোলনগুলোই বর্তমান মধ্যপ্রাচ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। এগুলোই সবচেয়ে সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলন। রাজনৈতিক দৃশ্যপটে তাদের উপস্থিতি ব্যাপক। এদের সদস্যরা মিশর, জর্ডান, ইয়েমেন, কুয়েত, মরক্কো, আলজেরিয়া, ইরাক ও বাহরাইনে সংসদীয় বৈধতা ও সরকারি পদ-পদবির অধিকারী। আবার কিছু দেশে তারা গুরুতরভাবে নিষিদ্ধ। যেমন তিউনিসিয়া, সিরিয়া, লিবিয়া ও সৌদি আরব (আরব বসন্তের পর এ ক্ষেত্রে বেশ পরিবর্তন এসেছে)। যদিও তাদের শিক্ষার উৎস এবং প্রেক্ষাপট এক, কিন্তু আন্দোলনগুলো দেশভেদে ব্যাপক ভিন্ন হয়ে থাকে। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ দেশের এজেন্ডা ও